বিষয় ঃ

# মাইজভান্ডারী ত্বরিকার
# আলোকে
# রূহানী উৎকর্ষ

আয়োজনে ঃ মাইজভান্ডারী ফাউন্ডেশন

---

বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম

ক্ষুদ্র বালুকা কণা যেমন দর্পণ বা আয়নার যোগ্যতা রাখে তদ্রূপ এই মাটির সৃষ্টি মানবও সূক্ষ্ম শক্তি সুগুণ সম্পন্ন ফেরেশতা “ধনাত্বক” আনুগত্য-প্রকৃতি সম্বলিত এবং নিজ সূক্ষ শক্তি বিমুখ স্থুল পারিপার্শ্বিক প্রভাব মুগ্ধ “ঋনাত্বক” বিরোধ প্রকৃতি সমন্বয়ে ব্যক্তি ও গন্ডি এবং ব্যাষ্টি প্রভাব শক্তি সম্পন্ন স্রষ্টা গুনজ দর্শন যোগ্য শক্তিশালী জীব।
পালক বর্দ্ধক পরম সূক্ষ আলাহ্ গুনজঃ। তাই এই মহাশক্তির আত্মবিকাশই “এরফান” পরিচিতি, মানবতা-সৃষ্টি সাফল্য নির্বাণ বা লয়।

খাদেমুল ফোকারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভান্ডারী (রহঃ)

## ১. ভূমিকাঃ

আলাহ্ তায়ালা এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা কীর্তন। সকলের গতি ও প্রত্যাবর্তন তারই দিকে। তারই উত্তম সৃষ্টি মানুষ; আশরাফুল মাখলুকাত। যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তারই প্রতিনিধিত্বের জন্য। তবে এই সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ মানব নাছুতি জগতে তার কাজের প্রতিফলে নাছুতী জগতের প্রেরণা, স্বার্থ, কাম, ইত্যাদি রিপুর জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মানবাত্মা ও তার প্রভুর মাঝে আড়ালের সৃষ্টি হয়। প্রভুর প্রেম সংশ্রব থেকে বহুদূরে পর্দার আড়ালে পতিত হওয়ায় মানবাত্মা প্রভুর পুনঃসঙ্গ লাভের আশায় ভীষন বিচলিত ও ব্যাকুল। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তথা প্রভুর সাথে মানুষের পুনঃসম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং উভয়ের মাঝে বিদ্যমান পর্দা সরানোর জন্য তার খোদা মিলন পথের দিশা পাওয়ার দরকার। আর এই ঐশী পথের দিক নির্দেশ দেয়ার নিমিত্তে মহান প্রভু যুগে যুগে নবী, রাসুল, হাদী ও ওলীদের প্রেরণ করেছেন। কালের দূরত্বে মানব যখন মহান প্রভুর আদর্শকে, প্রভু-পরিচিতি জ্ঞান ও প্রেম-প্রীতিকে ভুলে বসে, তখন এ ওলী-হাদীরাই মানব জগতকে প্রভুর আনুগত্য, প্রীতি ও প্রেম-প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ করে তার মিলন পথে পৌছিয়ে দেন। আলাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন,

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

অর্থ্যাৎ: "হে রাসুল (দঃ) আপনি বলুন, তোমরা যদি আলাহ্কে ভালবেসে থাক তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আলাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ।" এই আয়াতানুযায়ী হাকীকতে মুহাম্মদী বা ইনসানে কামেলের আনুগত্যই প্রভুর আনুগত্য। খোদার আনুগত্য ও অনুগ্রহ লাভের জন্য খোদা অনুরাগীর আনুগত্য একান্ত প্রয়োজন। আনুগত্যের এই ধারা নবীর (দঃ) তিরোধানের পর তার খেলাফতের ধারাবাহিকতায় আলাহ্র ওলীদের মাধ্যমে আবহমানকাল পর্যন্ত জারী আছে ও থাকবে। বিশ্ব ত্রান কর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছুল আজম হযরত মাওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আহমদ উলাহ্ মাইজভারী (কঃ) এর আগমন গঠেছে মানবতার মুক্তির পথ নির্দেশপূর্বক স্রষ্টার সাথে মানবের মিলন-দ্বার উন্মোচনের জন্য। তিনি যুগোপযুগী ও চিত্তাকর্ষক কৌশল, ভাবধারা, কার্যকলাপ ও রীতিনীতি এবং চরিত্র-মাধুর্য দ্বারা মানব জাতীকে আলাহ্ তায়ালার প্রেম-পথে আহবান করে মানবের সর্বপ্রকার মুক্তির পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে হযরত গাউছুল আজম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাইজভান্ডারী ত্বরিকার আলোকে রূহানী উন্নয়নের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। রূহানী উৎকর্ষতার স্বরূপ, ইসলাম ধর্ম চর্চায় অধ্যাত্ববাদের অবস্থান, মাইজভান্ডারী ত্বরিকার উৎপত্তি, মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় পীরে ত্বরিকতের খেলাফত প্রাপ্তির গুরুত্ব, বাইয়াতের নিয়ম-দস্তুর উসুলে সাবআ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

### ২.১. রূহানী উৎকর্ষতার স্বরুপ

আলাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন,

ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما اوتيتم من العلم الا قليلا

অর্থাৎ: "তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, রূহ আমার প্রভুর আদেশ ঘটিত। তোমাদেরকে এই বিষয়ে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে ।"

অন্য আয়াতে আলাহ্ তায়ালা বলেন,

واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم او شهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا

অর্থাৎ: "আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি ।"

সাহাবী উবাই ইবনে কাব (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আদম সন্তানদের রূহকে একত্রিত করা হয়। রূহগুলোকে কথা বলার শক্তি দেয়া হয়। এরপর তাদের কাছ থেকে ওয়াদা গ্রহন করা হয়। এবং "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" এই প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হয়, তারা সাক্ষ্য দেয় যে, "হ্যাঁ। আপনি আমাদের প্রভু" ।

আয়াতদ্বয়ের মমার্থে এটাই পরিস্ফুটিত যে, 'রূহ' সৃষ্টিগতভাবে আলাহর আদেশের প্রতিভূ ও তার মারেফতের অধিকারী। এবং আলাহর আদেশ নিষেধের প্রতি আনুগত্যশীল। এই আনুগত্য ও খোদা পরিচয় জ্ঞানের কারনেই যখন তার কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হয়েছিলো তখন সে নির্দ্বিধায় আলাহকে তার রব হিসেবে স্বীকার করে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু যখনই এই সূক্ষদেহী রূহ স্থুল মাটির দেহের সাথে মিলিত হয় তখন থেকেই তার অবস্থার গুনগত পরিবর্তন ঘটে। রূহ এবং তার আযলী আনুগত্য ও মারেফাতের মাঝে নাছুতি জগতের বিভিন্ন আচার ও বৈশিষ্টাবলী আড়াল হয়ে দাড়ায়। এই পার্থিব জগতে তাই রূহের অধিকারী মানবতার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে দাড়াঁয় তার রূহকে পাপ পরিশোধন ও পবিত্রকরনের দ্বারা নাছুতী আড়াল মুক্তির মাধ্যমে রূহের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া; যে পবিত্র অবস্থায় অবস্থান করে রূহ একসময় আলাহকে তার প্রভু হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছিলো। বস্তুত এই সাক্ষ্য প্রদান ছিল আলমে আরওয়াহে রূহের উবুদিয়্যতের চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আর এই আলমে নাছুতে মানুষ তার স্বত্বায় উবুদিয়্যতের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বিকাশের মাধ্যমে সদা বিরাজমান সেই মহিমান্বিত স্বত্বার সাথে তার রূহের পরিপুর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে ব্রতী হয়। আর এটাই স্রষ্টার সৃষ্টি-উদ্দেশ্য। আলাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষনা করেন,

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

অর্থ্যাৎ: আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধুমাত্র ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি ।

### ২.২.

মানবের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধনে ব্রতী হওয়ার বিষয়টি ইসলাম ধর্ম চর্চার মৌলিক একটি অংশ। এই রূহানী দিকটি মুলতঃ ধর্মের তিনটি মৌলিক বিষয়ের অন্যতম; ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। হাদীসে জিবরীলে এই বিষয়টি স্পষ্টাকারে বর্ণিত হয়েছে।

---

সুরা আলে ইমরান, ৩১

---

সুরা ইসরা, ৮৫
সুরা আরাফ, ১৭২
মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল,
সুরা জারিয়াত, ৫৬
সাহিহ মুসলিম, বাবু মারিফাতিল ইসলাম ওয়াল ঈমান ওয়াল কাদর

طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله، ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন আমার বাবা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ্ (দঃ) নিকট বসেছিলাম। এমন সময় একজন লোক আসলো। তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিলো ধবধবে সাদা আর মাথার চুল ছিলো মিশমিশে কালো। সফর করে আসার কোন আলামত তার মাঝে দেখা যায়নি। আমাদের কেউ তাকে চিনলও না। তিনি নবী (দঃ) এর সামনে এসে তার হাঁটু রাসুল (দঃ) এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে হাতের তালু হাঁটুর উপর রেখে বসলেন।

তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ (দঃ) আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।

রাসুল (দঃ) বললেন, ইসলাম মানে তুমি সাক্ষ্য দিবে যে আলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, এবং মুহাম্মদ (দঃ) আলাহ্র রাসুল (দঃ); সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে আর সামর্থ থাকলে হজ্ব আদায় করবে। তিনি (আগন্তক) বললেন আপনি সত্য বলেছেন।

ওমর (রা) বলেন, আমরা তার কথা শুনে অবাক হলাম। কারণ তিনি (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করে আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) সত্যায়ন করছেন।

এরপর তিনি (আগন্তক) প্রশ্ন করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।

রাসুলালাহ (দঃ) বললেনঃ ঈমান মানে তুমি আলাহ্, তার ফেরেশতা, অবতীর্ণ কিতাবসমুহ, তার রসুলগন ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এবং তাকদীর ও এর ভালো-মন্দের প্রতিও ঈমান আনবে।

তিনি বললেন আপনি সত্যই বলেছেন। এবার লোকটি বললো, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।

রাসুল (দঃ) বললেন, তুমি এমনভাবে আলাহ্র ইবাদাত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ; যদি তাকে না দেখতে থাকো তবে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে। ........

এই হাদীস শরীফের পরবর্তী অংশে আগন্তক ব্যক্তি কিয়ামত দিবস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং রাসুল (দঃ) তার উত্তরে কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করেন। হাদীস শরীফের একেবারে শেষাংসে বর্ণিত হয়েছে যে,

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

অর্থাৎঃ ওমর (রাঃ) বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রাসুলালাহ্ (দঃ) আমাকে বললেন, ওমর! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে ছিলো? আমি বললাম, আলাহ্ও তার রাসুলই অধিক জ্ঞাত। তিনি (দ;) বললেন ইনি ছিলেন জিবরিল (আঃ)। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত জিবরিল (আঃ) হযরত রাসুল (দঃ) কে নাম ধরে 'ইয়া মুহাম্মদ' বলে সম্বোধন করছেন। অন্যদিকে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে,

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

হাদীস শরীফের শেষাংসে রাসুল (দঃ) বলেন, "ইনি ছিলেন জিবরিল (আঃ)। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন"। এই অংশের উপর ভিত্তি করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই হাদীসে আলোচিত বিষয়গুলো সন্দেহাতীতভাবে ধর্মের মৌলিক অংশ। তাই হাদীসে বর্ণিত এসব অংশের যে কোনটির অনুপস্থিতি ধর্ম চর্চা ব্যাহত করবে। এবং সাথে সাথে ধর্ম চর্চার মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় বলে বিবেচিত হবে।

### ২.২.১

হাদীসে জিবরিলের ঐতিহাসিক পটভুমি এই হাদীসের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। ঘটনাটি বিদায় হজ্বের পরে সংঘটিত হয়েছিলো। অর্থ্যাৎ এই ঘটনাটি হযরত রাসুল (দ:) এর জীবনের শেষাংসে সংঘটিত হয়। তখন ইসলাম ধর্ম পূর্নাঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো। অতএব হাদীসে জিবরিলের উদ্দেশ্য ছিলো হযরত রাসুলের (দ:) এর সামনে দ্বীনের সারমর্ম পেশ ও তার সত্যায়নের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদী কে দ্বীনে ইসলামের পূর্নাঙ্গ কাঠামো সম্পর্কে অবহিত করানো। আলাহর মনোনীত ধর্ম তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত; ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। এর কোন একটি বাদ গেলে দ্বীন অপূর্নাঙ্গ থেকে যাবে। যেমন, মাগরিবেন নামাজ তিন রাকআত। কেউ যদি খুব ভালোভাবে প্রথম দুই রাকআত আদায় করার পর তৃতীয় রাকআত আদায়ে অস্বীকার করে তবে তার নামাজই হবে না। তেমনিভাবে ইসলাম ধর্মের অর্ন্তগুঢ় আধ্যাত্বিকতার বিষয়কে অস্বীকার করা মুলত ধর্মের এক তৃতীয়াংশকে অস্বীকারেরই নামান্তর।

### ২.২.২.

বর্ণিত হাদীস শরিফের পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম প্রশ্ন ছিলো 'ইসলাম' সম্পর্কে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (দ:) দৃষ্টিগ্রাহ্য কাজের বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামের সংজ্ঞা ও কার্য পরিধি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি (দ:) তার উত্তরকে দুইভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম ভাগ ঈমান বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত; এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে আলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। এবং মুহাম্মদ (দ:) তার রাসুল।

দ্বিতীয়ভাগ কর্মের সাথে সম্পর্কিত। যথা সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানের রোজা রাখা, সামর্থ্য থাকলে হজ্ব আদায় করা। এই হাদীসের অন্য রেওয়াতে এসেছে,

الإسلام: أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان

অর্থ্যাৎ: ইসলাম মানে তুমি আলাহর ইবাদাত করবে, তার সাথে কিছুকে শরিক করবে না। সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে, রমজানের রোযা আদায় করবে । সাক্ষ্য দেয়া, ইবাদাত করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রোযা রাখা ইত্যাদি সব কিছুই বাহ্যিক দৃষ্টিগ্রাহ্য কাজের অর্ন্তভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রশ্নে আগন্তক জানতে চেয়েছিলেন, ঈমান মানে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ঈমান এর সংজ্ঞা ও পরিধি বর্ণনায় রাসুল (দ:) বলেন, ঈমান মানে তুমি আলাহ্, তার ফেরেশতা, অবতীর্ণ কিতাবসমুহ, তার রসুলগন ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এবং তাকদীর ও এর ভালো-মন্দের প্রতিও ঈমান আনবে। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ঈমানের ছয়টি মৌলিক আর্টিকেল রয়েছে। সেগুলো হ"ছ; আলাহ্, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমুহ, তার রসুলগন, আখেরাত ও তাকদীর এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। লক্ষনীয় যে, এই প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (দ:) অন্তরের সাথে সম্পর্কিত কাজের উলেখের মাধ্যমে ঈমানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিশ্বাস স্থাপন করা, কোন কিছুকে মনে প্রাণে গ্রহন করা, সত্য বলে মেনে নেয়া ইত্যাদি মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কিত লুকায়িত কাজ। যা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিলো, ইহসান কি? এই প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (দ:) বলেন, "তুমি এমনভাবে আলস্নাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ; যদি তাকে না দেখতে থাকো তবে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে।"

---

ইসলাম ও ঈমান শব্দদ্বয় একসাথে একস্থানে ব্যবহৃত হতে পারে। আবার আলাদা ভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। যদি আলাদাভাবে ভীন্ন ভীন্ন স্থানে ব্যাবহৃত হয় তবে ইসলাম ও ঈমান সম্পুরক অর্থ বহন করে; ইসলাম মানে যা ঈমান মানেও তাই। আর যখন একই স্থানে ব্যবহৃত হয় তখন ইসলাম ও ঈমান ভীন্নার্থ বহন করে। তখন ইসলাম বাহ্যিক কার্য্য পরিধি ও ঈমান অন্তর্গত কার্য্য পরিধির প্রতি দিক নির্দেশ করে।

সাহিহ বুখারী, বাবু সওয়াল জিবরিল নবী (দ:)

আলাহ্, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমুহ, তার রসুলগন, আখেরাত ও তাকদীর এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানের রোজা রাখা, সামর্থ্য থাকলে হজ্ব আদায় করা ইত্যাদির মাঝেই যদি আলাহর মনোনীত একমাত্র ধর্মের মৌলিক অংশগুলো পরিপূর্ণতা পেতো তবে এই হাদীসে তৃতীয় প্রশ্নের অবতারণা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আলাদাভাবে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কিত প্রশ্নদ্বয়ের পর স্বতন্ত্রভাবে 'ইহসান' সম্পর্কিত তৃতীয় প্রশ্নের অবতারনা করে আমাদেরকে এই বিষয়টিই গভীরভাবে উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করছে যে, ধর্মের পরিধি ও মুমিনের কার্যক্ষেত্র এখানেই শেষ নয়। বরং এর পরও একটি স্ত্মর বাকী আছে। সেই বাকী স্ত্মরকেই হাদীসের পরিভাষায় 'ইহসান' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইহসানের হাকীকত বর্ণনায় রাসুল (দ:) বলেন, "তুমি এমনভাবে আলস্নাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ; যদি তাকে না দেখতে থাকো তবে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে।" এখানে লক্ষনীয় যে, ইহসানের মাকামে ঈমান ও আমল উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট সন্নিবেশিত হয়েছে।

### ২.২.৩.

মাকামে ইহসান ঈমানের সর্বোচ্চ মাকাম। রাসুল (দ:) বলেন,

افضل الايمان ان تعلم ان الله شاهدك حيثما كنت

অর্থ্যাৎ: উত্তম ঈমান হলো, তোমার এই বিষয়টি জানা যে তুমি যেখানেই থাকনা কেন আলাহ্ তোমাকে দেখছেন।

বস্তুত কেউ যখন ঈমান আনেন তখন তিনি এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন যে, আলাহ্ সর্বজ্ঞ ও কোন কিছুই তার দৃষ্টির আড়াল নয়। সেক্ষেত্রে হাদীস শরীফে 'তুমি যেখানেই থাকনা কেন আলাহ্ তোমাকে দেখছেন' এই জ্ঞানকে আলাদভাবে উত্তম ঈমান বলার হেতু কি? গভীরভাবে বিশেষন করলে আমরা বুঝতে পারবো যে অত্র হাদীসে সাধারণ অর্থে 'জানা' বা 'জ্ঞান' উদ্দেশ্য নয়। বরং হৃদয়ের অন্তস্থলে আলাহ্ আমায় দেখছেন এই মহাসত্যকে উপলব্ধি করা ও সর্বক্ষণ আলাহর দৃষ্টিকে অনুভব করার হাল বা অবস্থা অর্জনই হাদীসের মুল শিক্ষা। এবং এটাই সর্বোচ্চ স্তরের ঈমান যা মাকামে ইহসানে পরিস্ফুটিত। তাই ইহসান যুগপৎভাবে ইলম ও আমল। রুহানী ও চারিত্রিক সব্যসাচিক শক্তি। এটা এমন এক অবস্থা যেখানে বিবেক ও বিশ্বাস, কথা ও কাজ এর সংমিশ্রনের ফলাফলে মানবাত্মা আধ্যাত্বিক উন্নতির দিকে প্রতিনিয়ত ধাবমান।

হাদীসের মমার্থে আমরা এটাও সহজে উপলব্ধি করতে পারি যে, ইহসান হচ্ছে বান্দা ইখলাসপূর্ণ এবাদাতে ডুবে গিয়ে মাহবুবের মোশাহাদা ও মোরাকাবার মাধ্যমে আলাহর অস্তিত্বে নিজকে সমর্পণ করে তার সঙ্গকে অনুভবরত অবস্থার তুঙ্গীয় বহি:প্রকাশ।

## ৩. মাইজভান্ডারী ত্বরিকা

ইসলাম ধর্মে ঐশী সাধনা ও প্রভুর নৈকট্য লাভের পথ পরিক্রমার এক আবশ্যম্ভাবী অধ্যায় সুফিবাদ। সুফীবাদ চর্চার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বহু ত্বরিকা বিকাশ লাভ করে, যেমনঃ কাদেরীয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, নকশ্‌বন্দীয়, মুজাদ্দেদীয়া ইত্যাদি। মাইজভান্ডারী ত্বরিকা সুফি সাধনারই এক বিশেষ ধারা । মাইজভান্ডারী ত্বরিকা কোরআন ও হাদিস ভিত্তিক ইসলামের মৌলিক ভাবাদর্শের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত একটি ত্বরিকা । বেলায়তে ওজমার অধিকারী গাউছুল আজম শাহ্ সুফী সৈয়দ আহমদ উলাহ্ মাইজআভারী (ক:) এই ত্বরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ত্বরিকার উৎসমূল বর্ণনায় শাহ্ সুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহ:) বলেন, "ত্রিবিধ বেলায়তি ধারা, নবুয়তী ধারার সমন্বয়ে অর্থ্যাৎ জাহের বাতেন তালীমে এরশাদী সহ শরীয়ত, ত্বরীকত, হাকিকত ও মারফত প্রভাবে ও সংমিশ্রণে মাইজভান্ডারী ত্বরীকারূপী মহাসাগরের উৎপত্তি। "

---

ত্বরিকা শব্দটি তাসাউফের পরিমন্ডলে বহুল ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ। সাধারণত: সূফী সাধকরা সাধনার যে পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য অর্জন করেন তাকেই ত্বরিকা বলা হয়।

মাইজভান্ডার' চট্টগ্রামস্থ ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। হযরত শাহ্ সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক:) এই গ্রামে জন্মগ্রহন করায় জন্মস্থানের নামানুসারে তিনি 'মাইজভান্ডারী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সেই সূত্রে তার প্রতিষ্ঠিত ত্বরিকাও 'মাইজভান্ডারী' ত্বরিকা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বেলায়তে মোতলাকা, পৃ:

অন্যান্য ত্বরীকার সাথে মাইজভান্ডারী ত্বরীকার সম্পর্ক বর্ণনায় হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রঃ) বলেন, "মাইজভান্ডারী ত্বরীকা সমস্ত ত্বরীকার সমাবেশ ও সর্ব ব্যষ্টনকারী। কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নক্সবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কলন্দরীয়া, ছরওয়ারদীয়া, তৈপুরীয়া, জোনায়দীয়া ইত্যাদি ত্বরিকা উহার অর্ন্তভুক্ত।"

এই ত্বরিকা আচার ধর্ম পালনের সাথে সাথে নৈতিক পরিশুদ্ধির উপর প্রাধান্য দেয়। ইসলাম ধর্মের চিরন্তন শান্তির বাণীকে ধারন করে, ধর্মের শাশ্বত মানবতার আদর্শকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে এই ত্বরিকার প্রতিটি কর্মকান্ডে।

## ৪. মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় রূহানী সাধনা

মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় রূহানী উৎকর্ষতার আঙ্গিক দুইটি স্তরে চর্চিত।

১. ক্বালব বা আত্মিক পবিত্রকরন।

২. চারিত্রিক গুনাবলী অর্জন।

### ৪.১.১. খেলাফত প্রাপ্ত পীরে ত্বরিকতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক তালীম প্রদান

হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) তার বেলায়তী কণ্ঠে ঘোষনা করেন, "যে কেহ আমার সাহায্য প্রার্থনা করিবে তাহাকে আমি উন্মুক্ত সাহায্য করিব। আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাসর তক্ জারী থাকিবে ।"

হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) তার ওফাতের পূর্বে আপন নাতি হযরত শাহ্ সুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারীকে (রহঃ) স্বীয় গদীর উত্তরাধিকারী নির্ধারন করে যান।

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহ:) তার উপর অর্পিত এই গাউছিয়ত ক্ষমতায় সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত হয়ে মাইজভান্ডারী পরিমন্ডলে আবির্ভূত হয়েছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী মানবদরদী এক নতুন স্বত্তা নিয়ে। সব্যসাচীর মতো যুগপৎভাবে রূহানি হেদায়ত আর মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত অছি-এ- গাউছুল আজম স্থাপন করেছিলেন রূহানী উৎকর্ষের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ।

সাজ্জাদানশীন মনোনয়নের মাধ্যমে গাউছিয়ত জারি রাখার এই নিয়মের অনুসরনে হযরত শাহ্ সুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারীও (রহ:) তার জীবিতাবস্থায় তদীয় তৃতীয় পুত্র হযরত শাহ্ সুফী সৈয়দ এমদাদুল হককে (মঃ জিঃ আঃ) নিজ গদীর উত্তরাধিকারী ও দরবারে গাউছুল আজমের সাজ্জাদানশীন সাব্যস্থ করে যান। তিনি শাহ্ সুফী সৈয়দ এমদাদুল হক (মঃ জিঃ আঃ) কে সাজ্জাদানশীনের দায়িত্ব অর্পনের বিষয়টি জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও তার লিখিত 'মানব সভ্যতা' নামক বইয়ের ভুমিকাংশে উল্লেখের মাধ্যমে প্রামান্যকরন করেন। তিনি জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, "সৈয়দ এমদাদুল হক হানফী মজহাব সুন্নতে এজমা বিধি ফতোয়া মতে আমার মনোনীত সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত। এতদ্বসংগে আমি ঘোষনা করিতেছি যে, আমার অবর্তমানে হজরতের হুজুরা শরীফে আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে আমি মনোনীত করে আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা দীক্ষা শজরা দান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রন অধিকার সম্পনু, এই গাউছিয়ত জারী-সফলতাদানকারী সাবস্ত করিলাম।"

---

মিলাদে নববী ও তাওয়ালোদে গাউছিয়া, পৃঃ ৪ ।

বেলায়তে মোতলাকা, পৃঃ ৪৯

'গদী' শব্দের অর্থ সিংহাসন, চেয়ার। এখানে রূপকার্থে গদী বলতে রূহানী উত্তরাধিকার ও ক্ষমতাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত কেবলার (কঃ) নশ্বর জীবনের শেষ

সময়ে একদিন জুমার নামাজান্ত আশেক ভক্ত-মুসুলীদের পক্ষ হয়ে মহলার সর্দার সায়াদ উদ্দীন এর ভাই আছাব উদ্দীন হযরতের (কঃ) সকাসে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন, হুজুর আপনার তবিয়ত ও শরীর দিন দিন কমজোর হয়ে যাচ্ছে। কোন সময় আপনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান, তারতো কোন ঠিক নাই, হুজুর স্বয়ং থাকতে হুজুরের বড় নাতি সৈয়দ মীর হাছানকে গদীতে বসিয়ে গেলে আমাদের জন্য ভাল হতো। হযরত কেবলা এই ফরিয়াদের উত্তরে বলেন, মীর হাছান মিঞা নাবালেগ, আমার 'দেলাময়না' বালেগ! দেলাময়নাই আমার গদীতে বসবে।" বড় ভাই মীর হাছানকে (রহঃ) 'নাবালেগ' আর ছোট ভাই সৈয়দ দেলাওর হোসাইনমাইজভান্ডারীকে (রহঃ) 'বালেগ' বলার এই বাস্তবতার বিপরীত রহস্যবাক্য উপস্থিত আশেক-ভক্তগন বুঝতে পারেন নাই। হযরতের (কঃ) পরলোক গমনের তেতালিশ দিন পর যখন মীর হাছান মিঞাও জান্নাতবাসী হন তখন সকলে হযরতের পবিত্র কালামের রহস্য অনুধাবন করতে ক্ষম হন। যা ছিলো তার অসংখ্য কারামতের অন্যতম।

"মানব সভ্যতা " বইয়ের ভুমিকাংশে তিনি উলেখ করেন, "অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদাই তাহা ভালো জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী" সমাজ-সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়ন মূলক সমাজ সংগঠক পদ্বতির সফলতার উদ্দেশ্যে হানেফী মজহাব এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেইভাবে কামেল অলীউলাহর নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদীর সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত তদ্‌মতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে "সাজ্জাদানশীন" মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম ।" হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহঃ) কর্তৃক এভাবে 'যোগ্যতম' ঘোষনার মাধ্যমে শাহ সুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভান্ডারীকে (মঃ জিঃ আঃ) সাজ্জাদানশীন মনোনয়নের বিষয়টি মাইজভান্ডারী সাধক গায়কদের গানে ফুটে উঠেছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে।

যোগ্যতম ঘোষনা দিয়ে তান গদীতে বসাইয়ে
শাল পড়াইয়ে ময়না তানে রুহী ওয়ারেছ করে যান।
(শানে গাউছে মাইজভর, ১৬ নং গান)

বর্তমান সময়ে সূফীবাদ তথা পীর সাহেবদের সম্পর্কে সমাজের একাংশের মনে যে নেতিবাচক ধারনার জন্ম নিয়েছে তার অন্যতম প্রধান কারন ভন্ড পীরদের দৌরাত্ম্য। ভন্ড পীর চেনার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে পীরের শাজরা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। তিনি খেলাফতপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হওয়া। এ প্রসঙ্গে হযরত অছি-এ-গাউছুল আজম (রহঃ) বলেন, " বিশেষতঃ পীর ছাড়া পীর, ধর্মীয় বাধঁন হারা ফকির, কোরান হাদিস, ছুফী মতবাদ জ্ঞানহীন ফিকিরবাজ লোকের কাজ কারবারের ফলে ফকীরীর নামে যে উশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে এই গুলির প্রতিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কামেল পীর, বুজুর্গানের নামে হুকুম, স্বপ্ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যমুলক মিথ্যা কথা ফলাইয়া যাহারা এই ব্যবসা চালায় এবং সরল বিশ্বাসী লোককে ঠকায় তাহারা অনেকেই নিজের কোন ছিলছিলা দেখাইতে না পারায় নিজেকে মাইজভান্ডারী বা আজমিরী বলিয়া পরিচয় দেয়। যেহেতু এই দেশে উক্ত দুই দরবারের নাম শান অতি প্রসিদ্ধ।

### ৪.১.২. বাইয়াত প্রথার অনুসরণ

মাইজভান্ডারী পরিমন্ডলের অধ্যাত্ম সাধনা দুই স্তরে বিদ্যমান।

১. আম ( عام )
২.খাছ ( خاص )

'আম' আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টি হযরত গাউছুল আজমের (কঃ) গাউছে আজমিয়তের সাথে সর্ম্পকিত। তার ওফাতের পরও তার পবিত্র মাজার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মিলন কেন্দ্র। এখনও অসংখ্য প্রেম-পিপাসু সাধক তার মাজার জিয়ারত করে তার খোদাদাদ আধ্যাত্মিক কৃপাবারি অর্জন করছেন। হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহঃ) হযরত কেবলার (কঃ) এই খোদাপ্রদত্ত বিশেষত্ব বর্ণনায় বলেন,

কামেলের মাজার জান সর্ব দুঃখ হারী ।
প্রেমিকের অন্তরে ঢালে শান্তি সুধা বারি ।

অন্যদিকে 'খাছ' আধ্যাত্মিক কর্মসূচি তার ত্বরিকত তথা শাজরার ধারাবাহিকতায় মনোনীত সাজ্জাদানশীনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এক্ষেত্রে মাইজভান্ডারী ত্বরিকার 'খাছ' আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মাইজভান্ডারী ত্বরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত সাজ্জাদানশীন পীরে কামেলের হাতে বায়াত গ্রহন করা।

### ৪.১.২.১. মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় বায়াত পদ্ধতি

হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) এর শাজরার ধারাবাহিকতায় মনোনীত সাজ্জাদানশীন পীরে ত্বরিকত কাদেরীয়া মাইজভান্ডারী ত্বরিকার নিয়ম দস্তুর অনুযায়ী বায়াত প্রদান করেন। প্রথমে পীরে ত্বরিকত মুরীদকে

আউযুবিলাহ্ ও বিসমিলাহ্ পড়াবেন। এরপর বায়াত প্রদান করেন। বায়াতের ভাষা (Text) সাধারণত নিম্নরূপ ফরম্যাটে হয়।

'আমি আলাহর প্রতি বিশ্বাসী, এবং তাহার অবতীর্ণ ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল। আলাহতায়ালার প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতিও বিশ্বাসী এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে যা কিছু নিয়ে আমাদের নিকট এসেছেন তার প্রতিও প্রগাঢ় বিশ্বাসী।

সমস্ত বাতেল ধর্ম-বিধান ও অন্যায় পাপ কার্য্য হতে বিরতি ঘোষনা করছি। আমি এই মুহূর্তে স্বীকার করছি যে একমাত্র আলাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পণ করলাম। সর্বান্তকরণে এটাও স্বীকার করছি যে, আলাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মদ (স:) তার অনুগত রাসুল।

আমি আমার ধর্মীয় এখতেয়ার বা ইচ্ছা শক্তিকে খোদার প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট তার অনুগামী খলিফা বা প্রতিনিধিগনের মধ্যস্থতায় কাদেরীয়া ত্বরীকাতে, ঐ ত্বরীকার যুগ সংস্কারক মোজদ্দেদ হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর প্রদর্শিত মতে অনুসরণ করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি।

এবং স্বীকার করছি আমি শিরিক করব না। চুরি করব না। জেনা বা বলাৎকার করব না। সৃষ্টি করা কোন মিথ্যা প্ররোচনায় লিপ্ত হবো না। এবং সৎকার্য্যে তার বিরুদ্ধাচরণ করব না।

আমি রাসুলুল্লাহ্ (দ:) এর নিকট তার আছহাব ও খলিফাগণের মধ্যস্থতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি; আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। নামাজ কায়েম রাখব। রমজান মাসে রোজা রাখব। আল্লাহ্ তায়ালা যোগ্যতা দান করলে জাকাত আদায় করব। সমর্থ হলে হজ্ব করব ।'

### ৪.১.২.২ মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় মুরিদের জন্য নির্ধারিত ছবক

বায়াতের পর পীরে ত্বরিকত মুরীদকে প্রাথমিক স্তর, 'নাফছে আম্মারা' স্তরের জিকির 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালক্বীন দেন। হাদীস শরীফে এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জিকিরকে ঈমানকে নতুনত্ব দানকারী জিকির হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসুল (দ:) বলেন,

جددوا إيمانكم ، قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: " أكثروا من قول لا إله إلا الله

অর্থাৎ: তোমরা তোমাদের ঈমানকে সংস্কার কর। তাকে (দ:) বলা হলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা কিভাবে আমাদের ঈমানকে সংস্কার করবো? তিনি বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি করে বল । অন্য রেওয়াতে এসেছে, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মাধ্যমে তোমাদের ঈমানকে সংস্কার কর ।

এই জিকির প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর সম্ভব হলে কমপক্ষে ১০ থেকে ১০০ বার আদায় করার নিয়ম। আর সময় না থাকলে বা সম্ভব না হলে কমপক্ষে একটি ওয়াক্তিয়া নামাজের পর হলেও জিকির আদায় করতে হবে। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মাইজভান্ডারী ত্বরিকার অনুসারীদের অবশ্যই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে। তবে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর জিকির করার সুযোগ ও সময় নাও থাকতে পারে তাই কমপক্ষে যে কোন একটি ওয়াক্তের নামাজের পর জিকির আদায় করতে হবে। এছাড়া সবসময় নির্ধারিত সংখ্যার জিকির সম্ভব নাও হতে পারে। তাই কমপবে ১০ বার থেকে ১০০ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যায় জিকির করার অনুমতি আছে। জিকির শেষ হলে দরূদ শরীফ পাঠান্তে দোয়া করবে। জিকির করার সময় অবশ্যই নামাজের শেষ বৈঠকে বসার মতো করে বসে ধ্যান করে জিকির করতে হবে। মুরিদের জন্য জিকির পদ্ধতিতে এই ধরনের (flexibility) খুবই বিরল। নেই বললেই চলে।

অন্যান্য জিকির পদ্ধতির সাথে তুলনামুলক পর্যবেক্ষনে আমরা দেখতে পাই যে মাইজভান্ডারী ত্বরিকার জিকির বর্তমান আত্মকেন্দ্রীক, সদাব্যস্ত ও প্রতিযোগীতামুলক সমাজ কাঠামোর জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বর্তমান সময়ে খুব কম মানুষই দৈনিক হাজার বার জিকির, দরূদ ইত্যাদি ছবক পালনের সক্ষমতা ও সময় রাখে। এক্ষেত্রে মুরিদের উপর মাত্রাতিরিক্ত সবক চাপিয়ে দিলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা থাকে। আবার হেঁটে হেঁটে, ট্রেনে-বাসে বা অন্য কোন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ত্বরিকতের জিকির করলে জিকিরে মুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই মাইজভান্ডারী ত্বরিকার জিকির একদিকে যেমন সহজ ও সরল তেমনি ধ্যান করে জিকির করার নিয়মের কারনে এর মাধ্যমে ক্বালব তুলনামুলকভাবে দ্রুত পবিত্রতা অর্জন করে নুরে মুহাম্মদীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্য হয়ে উঠে। এ থেকে আমরা এটাও বুঝে নিতে পারি যে মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় সংখ্যার (Quantity) চাইতে গুনগত মানকে (Quality) বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। এক্ষেত্রে রাসুল (দ:) এর দিক নির্দেশনা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل

অর্থাৎ: তোমরা তোমাদের সামর্থানুযায়ী আমল করতে থাক। কেননা (তোমাদের আমল কবুল করার ক্ষেত্রে) আল্লাহ্ তায়ালা ক্লান্ত হননা বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। (ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ইবাদাতে একঘেয়েমির লাগে এবং এই ধরনের ইবাদাত আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কমই কবুল হয়।) নিয়মিত পালন করা হয় এমন কাজই আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে বেশি প্রিয়, যদিও তা পরিমানে কম হয়।

মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় এই জিকিরের বিশেষ কয়েকটি দিক রয়েছে। যথা: জিকির পদ্ধতি, বরযখ ও ক্বালব।

#### ৪.১.২.২.১. বরযখ

মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় জিকির আদায়কালীন সময়ে পীরে কামেলের মুখমন্ডল ধ্যান করার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। মাইজভান্ডারী পরিমন্ডলে এই পদ্ধতি 'বরযখ' ধ্যান হিসেবে পরিচিত। ত্বরিকতের জিকির কালীন সময়ে আপন পীরে কামেলের মুখমন্ডল ধ্যান করার এই পদ্ধতি সামগ্রীকভাবে তাসাউফের পরিমন্ডলে 'রাবেতা' নামেও পরিচিত। বরযখ ধ্যানের বিষয়টি মাইজভান্ডারী পরিমন্ডলতো বটেই সামগ্রীকভাবে তাসাউফ চর্চায়ও এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে। জিকিরের মধ্যে একাগ্রতা আনয়ন, পীরে কামেলের সাথে আপন ক্বালবের রূহানী যোগসূত্র স্থাপন, সর্বোপরী হাকিকতে মুহাম্মদী (দ:) এর সাথে রূহানী সম্পর্কে স্থাপনের প্রয়াসে 'বরযখ' ধ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। আপন ক্বালবে নিজ পীরে কামেলের স্বরন কতটুকু দৃঢ় হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে মুরিদ তার রূহানী উৎকর্ষতার বিষয়টিও অনুধাবন করার সক্ষমতা লাভ করে।

বিশিষ্ট সূফী গবেষক ও লেখক হযরত আবদুল ওহাব শারানি (রহ:) বলেন,

الأدب الرابع: أن يستمد عند شروعه في الذكر بهمة شيخه بأن يشخص بين عينيه ويستمد من همته ليكون رفيقه في السير.

অর্থাৎ: (জিকিরের) চতুর্থ আদব: জিকির আরম্ভের প্রাক্কালে আপন দৃষ্টি শক্তিতে নিজ পীরে কামেলের অবয়ব ধ্যান করার মাধ্যমে তার রূহানী শক্তি আহরন করা। ছায়রে রূহানীতে পীরে কামেলের সাহচর্য হাছিলের উদ্দেশ্যেই তার রূহানী শক্তির কাছে সাহায্য চাইবে।

الأدب السابع : أن يخيل شخص شيخه بين عينيه ما دام ذاكرا

এরপর তিনি বলেন, সপ্তম আদব হচ্ছে, যতক্ষণ জিকির করবে ততক্ষণ আপন পীরে কামেলের ধ্যান করবে ।

#### ৪.১.২.২.২. ক্বালব

ক্বালবের শাব্দিক অর্থ হৃদয় বা হৃদপিন্ড (Heart)। শরীরের একটি বিশেষ অঙ্গ। বুকের বাম পাশে অবস্থিত। যার কাজ হচ্ছে শরীরে রক্ত পাম্প করা। তবে তাসাউফের পরিভাষায় ক্বালব ভীন্ন আঙ্গিকে ভীন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। পবিত্র কোরআন ও হাদীসেও ক্বালব ভীন্ন কৌনিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

অর্থাৎ: চোখ অন্ধ হবেনা। বরং বুকের মাঝে অবস্থিত হৃদয় অন্ধ হয় ।

---

বুখারি, লিবাস অধ্যায়।

আনওয়ারুল কুদসিয়্যাহ, পৃ: ১০৭

সূরা হজ, ৪৬

এখানে হৃদয় অন্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বুকের বাম দিকে অবস্থিত হৃদপিন্ড নামের এই অঙ্গের চোখের মতো দৃষ্টি শক্তি আছে এটা এখনও কোন চিকিৎসকই বলেননি। কিন্তু কোরআনে বর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে, ক্বালবের দৃষ্টি শক্তি আছে। কারণ, দৃষ্টি শক্তি থাকলে তবেই না অন্ধ হওয়ার প্রশ্ন আসে। সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, আয়াতে ক্বালব ও দৃষ্টি শক্তি ভীন্নার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাসাউফের পরিমন্ডলে ক্বালব বলতে আমরা বুঝি খোদাপ্রদত্ত একটি আধ্যাত্মিক লতিফা। বুকের বাম পাশে অবস্থিত শারিরীক ক্বলবের সাথে এই লতিফার বিশেষ ধরনের সম্পর্ক আছে। ইমাম গাজ্জালীর ভাষায় এই লতিফাটিই মানুষের স্বরূপ, বোধশক্তির আওতাভুক্ত, আলেম, সম্বোধিত ও তিরস্কৃত। হিসাব নিকাশের সম্পর্কও এর সাথে। এই সূক্ষ ক্বালব নামীয় লতিফার হাকীকত উদ্ধার করা সাধারণ মানুষের জ্ঞান-সীমার বাহিরে।

অন্য একটি উদাহরণের মাধ্যমেও আমরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি। কোন বান্দার মাঝে যখন খোদায়ী প্রেম-প্রেরণা সম্ভুত ভাব-বিভোরতা মাত্রাতিরিক্ত আকার ধারন করে আপন নিয়ন্ত্রন ক্ষমতার উর্ধ্বে চলে যায় তাকে সুফী পরিভাষায় ওয়াজদ বলা হয়। আমরা এই 'ওয়াজদ' নামক অবস্থাকে মস্তিষ্ক বিকৃতির অবস্থার সাথে তুলনামুলক পর্যবেক্ষন করতে পারি। পাগলামীর সাথে সম্পর্ক হচ্ছে মস্তিষ্কের সাথে। মস্তিষ্কের সমস্যার কারনে পাগল বা মানসিক রোগীর আচার-আচরণ অনিয়ন্ত্রিত ও বেসামাল হয়। অন্যদিকে ওয়াজদ নামক 'হালে'র সম্পর্ক ক্বালব নামক লতিফার সাথে। আর তাই ওয়াজদ প্রাপ্ত ব্যক্তি সবল হৃদপিন্ড ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধীকারি হলেও ক্বালব নামক লতিফার অবস্থাগত ও খোদায়ী তাজাল্লি সম্ভুত গুনজ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের কারনে সাময়ীকভাবে তার আচরণ অনিয়ন্ত্রিত থাকে। সেক্ষেত্রে পাগল বা মানসিক রোগীকে যেমন ওয়াজদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যাবেনা তেমনি ওয়াজদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাময়িক অনিয়ন্ত্রিত আচরণের কারনে তাকে মানসিক রোগীর কাতারে ফেলাও অনুচিত হবে।

### ৪.১.২.২.৩. জিকির পদ্ধতি

মাইজভান্ডারী ত্বরিকার জিকির পদ্ধতিতে ক্বালব নামক লতিফার গুরুত্ব অপরিসীম। নাফছে আম্মারা স্তরের জিকিরের মুল লক্ষই থাকে ক্বালব নামক লতিফার পবিত্রকরণের মাধ্যমে বান্দার অর্ন্তজগতকে নুরে মুহাম্মদীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্য করে তোলা।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জিকির করার সময় চারটি লতিফাকে স্পর্শ করতে হয়; লতিফায়ে নাফছ, লতিফায়ে রুহ, লতিফায়ে আখফা ও লতিফায়ে ক্বালব। লতিফায়ে নাফছ নাভিমুলে অবস্থিত। লতিফায়ে রুহ বুকের ডান দিকে স্তনের নিচে অবস্থিত। লতিফায়ে আখফা মাথার তালুতে অবস্থিত। আর লতিফায়ে ক্বালব বুকের বাম পাশে স্থনের নিচে অবস্থিত। নাভিমুলে অবস্থিত লতিফায়ে নাফছ থেকে লা (??) শব্দটি আরম্ভ করে লতিফায়ে রুহ স্পর্শ করে লতিফায়ে আখফাতে ইলাহা (???) বলে শ্বাস বন্ধ করবে। শ্বাস বন্ধ অবস্থায় থেকে 'ইল্লাল্লাহ' (??? ????)শব্দ দ্বারা লতিফায়ে ক্বালবে নি:শ্বাস খুলে সশব্দে আঘাত করবে।

এই জিকির পদ্ধতিতে আল্লাহর ইসমে জালালাত কিভাবে বান্দার ক্বালবের উপর প্রভাব ফেলে তার একটি চমৎকার উদাহরণ হযরত অছি-এ-গাউছুল আজম খাদেমুল ফোকারা দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহ:) মূলতত্ত্ব বইতে উল্লেখ করেছেন। হাতের সাথে হাত ঘষলে একধরনের উত্তপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। তেমনি আল্লাহ্ শব্দের সাথে সম্পর্ক ও ঘর্ষনে ক্বালব উত্তপ্ত হয়ে উঠে ও ক্বালবের পাপজনিত ময়লা বিদুরিত হয়। এর দ্বারা পার্থিব ভাব প্রেরণা দূরিভুত হতে থাকে ও মানুষের অন্তরে খোদাপ্রেম জাগ্রত হয়। মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় ঐশী প্রেমের বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

### ৪.১.৩. মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় ঐশী প্রেম-সাধনা

মাইজভান্ডারী ত্বরিকা ঐশী প্রেম মিশ্রিত ইবাদাতে উৎসাহ দেয়। এই ত্বরিকা প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসুলের (সঃ) সন্তুষ্টি অর্জনের উপর গুরুত্ব দেয়। প্রিয় রাসুল (সঃ) বলেন, "তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা-মাতা ও মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় ও কাম্য হই।" আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, "হে রাসুল (দঃ) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবেসে থাক তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" এই আয়াত অনুযায়ী খোদা-প্রেমেই সবকিছু আরম্ভ আর খোদা প্রেমেই শেষ। মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় এই ঐশী প্রেমবাদেরই চর্চ করা হয়। মাইজভান্ডারী ত্বরিকার অনুসারীদের সকল কিছুর উপরে আল্লাহ্ ও রাসুল (সঃ) এর অনুসরন ও ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়ার শিক্ষা ও দীক্ষা দেয়া হয়। ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি 'প্রেমময় মানুষ' আর মানবতার কল্যাণই এই ত্বরিকার অনুপম বৈশিষ্ট।

এই ঐশী প্রেম-নির্ভর উচ্চ মার্গীয় আধ্যাত্মিকতার কথা ঘুরে ফিরে এসেছে মাইজভান্ডারী সাধন-সংগীতে নানা মাত্রিক আঙ্গিকে।

চল গো প্রেম সাধুগণ- প্রেমেরী বাজার
প্রেম হাট বসাইয়াছে- মাইজভান্ডার মাঝার।।
সেথা একজন মহাজন- নূরে আলম গাউছ ধন।
সাধুগনের প্রাণ হরিয়ে- করেন বেপার।।
প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে- টুটা ফাটা দিল কিনিয়ে।
সেকান্দরী আয়না তাতে- করেন তৈয়ার।

মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে আলাহ্ ও রাসুলকে ভালবাসে, তখন তার অন্তরে বিশ্ব-মানবতার জন্যও ভালবাসার জন্ম নেয়। নিষ্ঠুরতা তিনি করতে পারেন না। তিনি অন্যের সুখে সুখী হন। অন্যের দুঃখে দুঃখী হন। খোদা-প্রেমের ছোঁয়ায় ধর্ম পালনে সজীবতা আসে। এই সজীব প্রাণোচ্ছল ধর্মের পরশে মানবতার মাঝেও নতুন প্রাণের ছোঁয়া লাগে।

ধর্মের আভরনে আমরা যে নিষ্ঠুরতা দেখি তা মুলত রসকসহীন শুষ্ক ধর্মনীতিরই ফল। এই ধর্ম পালনে খোদা-প্রেমের কোন ছোঁয়াছ নেই। এই ধর্ম নিষ্ঠুর। এই ধর্ম অন্ধ। এর মাঝে কোন প্রাণের সাড়া নেই। এই মৃত ধর্ম সমাজকে সঠিক পথের দিশা দেয়না। বরং এই ধর্ম মানব সমাজে হানাহানির অন্যতম কারণ হয়ে দাড়াঁয়।

তবে 'সকাম প্রেম' আর 'নিষ্কাম ঐশী প্রেমের' মাঝে যোজন যোজন ব্যবধান থাকলেও সাধারণ দৃষ্টিতে এদের মাঝের দেয়ালটিকে কখনওবা খুবই ক্ষীণ বা অদৃশ্য মনে হতে পারে। আর তাই মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় শুধু ঐশী প্রেমবাদের কনসেপ্টকে ধারন করা নয় বরং কামেল মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে শরীয়তের বিধি-নিষেধ অনুসরণের মাধ্যমে নিষ্কাম ঐশী প্রেম জাগ্রত করার কর্মসূচীই অনুসরণ করা হয়। আর তাই মাইজভান্ডারী ত্বরিকার প্রেমবাদে দীক্ষিত দৈহিক সত্তাগুলো নিজের জন্য যেমন মঙ্গলময় ও সৃজনশীল তেমনি তা ধর্ম, পরিবার, দেশ, জাতী ও বিশ্ব-মানবতার জন্যও কল্যাণময় ও সৃজনশীল। হাফেজ সিরাজীর (রহঃ) ভাষায়-

"তোমার চক্ষের পলক যখন বিশ্ববিজয়ী অসি বাহির করিল,
তখন দিল ঘায়েল জিন্দা মানুষ গুলি একের উপর অপর ঝাপাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।"

### ৪.২. উসুলে সাবআ বা সপ্ত কর্ম পদ্ধতির প্রবর্তণ

মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় বাইয়াত গ্রহন, জিকির, মুজাহাদা, মুরাকাবা, বরযখ ইত্যাদি রূহানী উন্নয়নকামী সবকের সাথে সাথে মানব চরিত্রকে সুন্দর ও সুস্থভাবে গড়ে তোলার উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে মানবের নফছে ইনসানীর কুপ্রবৃত্তি বন্ধ করে রূহে ইনসানীর সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার জন্য হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) নির্বিঘ্ন ও সহজসাধ্য মাধ্যম হিসেবে সকল ত্বরীকত পন্থীর নিকট আদৃত ও স্বীকৃত সপ্ত-পদ্ধতিকে পরিচিত করেছেন। দ্বিমাত্রার সপ্ত-পদ্ধতির রূপ-রেখা নিন্মরূপ।

১) ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর।

২) মাউতে আরবা বা চতুর্বিধ মৃত্যু।

### ৪.২.১. ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর

১) ফানা আনিল খাল্কঃ কারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা। এর ফলে আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। পরমুখাপেক্ষিতা মানুষের স্রষ্টা প্রদত্ত সহজাত শক্তি বিকাশের পথ বাধাগ্রস্ত করে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় তথা সামষ্টিক জীবনে উন্নতির জন্য আত্মনির্ভরশীলতার কোন বিকল্প নেই।

২) ফানা আনিল হাওয়াঃ যা না হলেও চলে, এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা। নিজের খেয়াল খুশীমত চলাফেরা না করা। এর ফলে জীবন যাত্রা সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয়। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে,

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى

অর্থ্যাৎঃ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে তার ঠিকান হবে জান্নাত ।

রাসূল কারীম (সাঃ) এরশাদ করেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه

অর্থ্যাৎঃ কোন ব্যক্তির ইসলাম পালনের সৌন্দর্য তার অনর্থক কাজ পরিহার করার মাঝেই নিহিত ।

শায়খ আহমদ জারুক বলেন, নেতিবাচক চরিত্রের মৌলিক উৎস তিনটি। নফসের সন্তুষ্টিমত চলা, মানুষকে ভয় করা ও রিযিক নিয়ে দুশ্চিন্তা করা। নফসের সন্তুষ্টিমত চলার কারনে যৌনলালসা, অলসতা ও পাপকার্যের ইচ্ছা জন্ম নেয়। মানুষকে ভয় করার কারনে বান্দার অন্তরে রাগ, হিংসা-বিদ্বেসের জন্ম নেয়। রিযিক নিয়ে দুশ্চিন্তার কারনে মানসিক রোগ, লোভ ও কৃপণতার জন্ম নেয়। তিনি বলেন, কিন্তু একটি বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সেটি হচ্ছে সর্বাবস্থায় নফসের সন্তুষ্টিমত না চলে প্রতিটি ক্ষণে এই নফস সম্পর্কে সাবধান থাকা । নফসের সন্তুষ্টিমত না চলার বিষয়কেই মাইজভান্ডারী ত্বরিকার পরিভাষায় ফানা আনিল হাওয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অতিরিক্ত ভোগ-লালসা মানুষের মাঝে পশু শক্তির উন্মেষ ঘটায়। পৃথিবীতে চলমান অস্থিতিশীল অবস্থার অন্যতম মৌলিক কারণ হচ্ছে চাহিদাতিরিক্ত লালসা। অনর্থ পরিহার পূর্বক শোষণহীন স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠাই গাউছিয়ত নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৩) ফানা আনিল এরাদা (খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া) : নিজ ইচ্ছা বাসনাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন করে তাছলিম ও রজা অর্জন করা।

### ৪.২.২. মাউতে আরবা বা চতুর্বিধ মৃত্যু

মৃত্যু একটি অতি পরিচিত শব্দ। কিন্তু মাইজভান্ডারী ত্বরিকায় রূপকার্থে ব্যবহৃত এই চারটি মৃত্যু মানে কামনা, বাসনা ও প্ররোচনাদানকারী নফসের পরিশোধন ।

১) মউতে আবয়্যাজ বা সাদামৃত্যুঃ উপবাস ও সংযমের মাধ্যমে অর্জিত এই মৃত্যুতে মানব মনে উজ্জলতা ও আলো দেখা দেয়। রমজানের রোজা বা নফল রোজা ইত্যাদি উপবাস ও সংযম পদ্ধতি। আলাহ্ তায়ালা বলেন, "হে বিশ্বাসীগন, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার" ।

রাসুল (দঃ) বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْحُزْنِ فَإِنَّهُ
مِفْتَاحُ الْقَلْبِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ الْحُزْنُ؟ قَالَ: أَجِيْعُوْا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوْعِ
وَأَظْمِئُوْهَا

তোমরা 'হুযন'কে আকড়ে ধর। কেননা তা ক্বালব উন্মুক্তকরনের চাবিকাঠি। সাহাবাগন বললেন, ইয়া রাসুলালাহ্ কিভাবে 'হুযন' হয়? তিনি (দ:) বললেন তোমরা তোমাদের নাফসকে ক্ষুদা ও পিপাসা দিয়ে কষ্ট দাও ।

বর্ণিত হাদীস শরীফে আমরা দেখতে পাই কিভাবে রাসুল (দ:) উপবাস বা সংযমকে নাফসকে দমনের একটি কার্যকরি মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এবং সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত করেছেন যে, এর দ্বারা মানবান্তর ঐশী তাজালির জন্য উন্মুক্ত ও যোগ্য হয়। কথিত আছে মহাত্মা গান্ধী জটিল সমস্যার সমাধানে উপবাস করতেন। তিনি বলতেন, "উপবাসে আমি আলো পাই।"

**২) মউতে আছওয়াদ বা কালোমৃত্যু:** সমালোচকের সমালোচনা, শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দুকের নিন্দায় বিরক্ত বা রাগান্বিত না হয়ে নিজের মাঝে সমালোচনার কারণ অনুসন্ধান করে তা সংশোধনের মনমানসিকতা অর্জনই কালোমৃত্যু। নিজের মধ্যে সমালোচিত বিশেষণ খুঁজে পেলে মানুষ একদিকে যেমন দোষ সংশোধনের সুযোগ পায় অন্যদিকে আল্লাহর নিকট আপন কৃতকর্মের জন্য তাওবা করার দ্বার উন্মোচিত হয়। আর নিজকে বিশ্লেষনপূর্বক আরোপিত দোষমুক্ত বলে নিশ্চিত হলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ও খোদার নেয়ামতের শোকর আদায়ের পথ সুগম হয়। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মউতে আছওয়াদ বা কালোমৃত্যুর আলোকে মাইজভান্ডারী ত্বরিকার অনুসারীরা তাদের ত্বরিকার সমালোচকদের বন্ধু মনে করে।

**৩) মউতে আহমর বা লালমৃত্যু:** কামস্পৃহা ও লোভ-লালসা হতে মুক্তিতে হাসিল হয়। অনিয়ন্ত্রিত কামস্পৃহা ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করে। রাসূল (স:) বলেছেন, "আমার উম্মতের জন্য আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা কামস্পৃহা ও দুরাশা"। কামভাব নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে লালমৃত্যুগুণ অর্জিত হয়ে সাধক অলীয়ে-কামেলের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

**৪) মাউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু:** নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে সবুজ মৃত্যু লাভ হয়। নির্বিলাস জীবন-যাপনের ফলে মানবান্তরে ঐশী প্রেম ভীন্ন কোন কামনা-বাসনা থাকেনা, সূফী মতে তা বেলায়তে খিজরীর অর্ন্তগত।

### ৪.২.৩.

উসুলে সাবআর বিশ্লেষণে হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহ:) বলেন, " এই সপ্ত পদ্ধতি, সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজসাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে এবং পরের দুঃখ কষ্টের কারণ না হইয়া বরং বন্ধুসুলভ হিতাথীরূপে দেখা দেয়।" "অন্যান্য বিশ্বধর্মীয় সাধনা সিদ্ধি ও নিয়মানুবর্তীর সঙ্গে বিরোধাত্মক নহে। বরং উৎসাহ বর্দ্ধক বাস্তববোধ জাগরণকারী, বিশ্ব সমস্যার সমাধানকারী মুক্তির দিশারী। "

বিশ্ববাসীর আত্মিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির জন্য হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) উসুলে সাবআর যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন পদ্ধতি দিয়ে গেছেন তা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পালন-সম্ভব একটি কল্যাণকামী কর্মসূচী। কোন মুমিন বান্দা যখন আপন মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে এই সপ্ত-পদ্ধতির অনুশীলন করে, তখন তার আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও পারলৌকিক সাফল্য লাভের পথ সুগম হয় এবং সাথে সাথে হেদায়তের আলোকবর্তিকারূপে আবির্ভূত হয়ে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ ধারকরূপে বিবেচিত হন। হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর (কঃ) অগনিত খলিফা ও অনুগ্রাহপ্রাপ্ত মনীষীগান তার সুস্পষ্ট প্রমান। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। "

অপর দিকে ভীন্ন ধর্মানুসারীদের জন্যও এই কোরআনী হেদায়তি সপ্ত-পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য। এই সপ্ত-পদ্ধতির অনুসরণের মাধ্যমে তারা একদিকে যেমন আপন চরিত্রকে উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে আরোহন করাতে পারেন, ঠিক তেমনি নিজকে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে মানবতার সেবক রূপে উপস্থাপন করতে পারবেন। কবিয়াল রমেশ শীল ও মন মোহন সাধু অমুসলিম মাইজভান্ডারী ভক্তের উজ্জল দৃষ্টান্ত । আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন, অতঃপর কেউ অনু পরিমান সৎকর্ম করলে তার ফল ভোগ করবে এবং কেউ অনু পরিমান অসৎকর্ম করলে তার ফল ভোগ করবে ।

### ৪.২.৪.

চলমান বিশ্ব-পরিস্থিতির পর্যালোচনায় আমরা দেখি বিশ্ব-মানবতা ইতিহাসের এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নৈতিকতার পরশহীন সমাজ ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে পুরো বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত। উন্নত বিশ্বের লেবেলধারী সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের লোভ-লালসা ও অচিন্ত্যনিয় বিলাসিতার খোরাক মেটাতে অবলিলায় আগ্রাসন চালাচ্ছে কমশক্তির ছোট ছোট দেশে, গ্রাস করছে অপরের সম্পদ। অপর দিকে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো তার প্রতিকার করতে পারছে না কারণ তারা তাদের অস্থিত্য রক্ষার জন্য অপরের প্রতি নির্ভরশীল। তাদের মাঝে আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মসমালোচনা নেই।

প্রিয় পাঠক! আসুন আমরা সামান্য কল্পনার আশ্রয় নিই। আমরা কল্পনা করি পৃথিবী কমপক্ষে এক ষষ্ঠাংশ মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মাইজভান্ডারী ত্বরিকার ভক্ত হয়ে সপ্ত-পদ্ধতির অনুশীলন করছে। গঠন করেছে এক বৃহত্তর মাইজভাসন্ডারী সমাজ। এই সমাজের সদস্যরা উসুলে সাবআর অনুসরণকারী প্রকৃত মাইজভান্ডারী হয়ে আল্লাহর একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাসী ও নিজ ধর্মের অনুশাসনের প্রতি আস্থাশীল। তারা আত্মনির্ভরশীল, সুখে-দু:খে খোদার ইচ্ছাশক্তিতে আত্মসমর্পিত ও সন্তুষ্ট। তাদের কোন পার্থিব লোভ-লালসা নেই, তাদের কামন-বাসনা সংযত। তারা আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত ও অপরের সমালোচনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোনে গ্রহন করেন। তারা অল্পে তুষ্ট এবং নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত । তারা ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ, সহনশীল ও ধর্ম-সাম্যে বিশ্বাসী এবং সাথে সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধেও সো"চার ।

সত্যিকার মাইজভান্ডারী চরিত্রের অধিকারী সদস্য দ্ধারা গঠিত এমন এক সমাজে হানা-হানি, হিংসা-বিদ্ধেষ, ধর্মীয় গোঁড়ামী সম্ভুত সমস্যা, পরধন গ্রাস ইত্যাদি অপকর্মের হার কতটুকু থাকবে তা বুঝতে অনেকের গবেষনার দরকার হলেও সেই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিতুলনায় অসংখ্যগুন ভালো হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। উপরন্ত এমন চরিত্রের অধিকারী কোন জাতী কখনই অন্যায় যেমন করতে পারেনা তেমনি অন্যায়ের শিকারও হয়না। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, হযরত কেবলা (কঃ) কর্তৃক নির্দেশিত উসুলে সাবআর মৌলিক উপাদানগুলোকে বাস্তব জীবনে পালন করতে পারলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যের সেতু বন্ধন স্থাপিত হবে।

## ৫. উপসংহার

ছায়রে রুহানী মানে অপরিশুদ্ধ আত্মা থেকে পরিশুদ্ধ আত্মায় উন্নীত হওয়া। শরীয়তের বাধঁনহীন মানব বিবেককে শরীয়তের ছাচেঁ গড়ে তোলা। রোগাক্রান্ত কপট ক্বালবকে শোধন করে সুস্থ খোদায়ী তাজাল্লীর বিকাশ সক্ষম সত্যবাদী ক্বালবে পরিণত করা। কঠোর শুষ্ক অন্তরকে ঐশী প্রেমজ রসে সিক্ত করে প্রভুর সন্তোষকামী কোমল অন্তরে পরিণত করা। ঐশী-কর্মে আন্তরিকতাহীন অলস স্বত্ত্বাকে উবুদিয়্যতের সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করা।

ছায়রে রুহানী মানে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করা। দেখা ও শুনার স্তরের দূর্বল ঈমানকে হক্কুল ইয়াকিনের স্তরের সবল ঈমানে উপনীত করা। ছায়রে রুহানী মানে বান্দা আপন প্রভুর প্রতি গতিশীল হয়ে তার পবিত্র জাতে বিলীন হয়ে থাকা। সর্বাবস্থায় খোদা সঙ্গ অনুভব করা।

বস্থবাদী আদর্শের চরম বিকাশ ও চর্চার এই যুগে মানুষ তার অস্তিত্যের মুল উদ্দেশ্য ভুলে বসে আছে; তার অন্তর পরিণত হয়েছে জ্যোতিহীন এক কাল গহবরে; আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থ চিন্তায় সদা মগ্ন সদস্য দ্বারা গঠিত এই সমাজ ব্যবস্থা পরিণত হয়েছে শোষন, বঞ্চনা আর বৈষম্যের এক অপ্রতিরোধ্য হাতিয়ারে। বিপন্ন মানবতার আজ দিকে দিকে মুক্তির মশালের বাহকের সন্ধান করছে।

বিশ্ব-মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রচারিত ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে আত্মস্থ করে বিকাশ লাভ করা সুফীবাদ এই সংকট নিরসনের প্রকৃষ্ট সমাধান। তবে সুফীবাদের এই সফলতাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠা পীরি-ব্যবসা আর ভন্ড বুজুর্গদের কর্মকান্ডে মুক্তি-আকাংখায় দিশেহারা মানবতা সুফীবাদ তথা সত্যের মশালের ধারক কামেল-অলীদের উপর থেকেও ক্রমান্বয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলছে।

বিশ্ব-মানবতার এই চর্তুমুখী সংকটে গাউছুল আজম হযরত শাহ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভান্ডারী (কঃ) আবির্ভুত হয়েছেন ঐশী হেদায়তের আলোকবর্তিকারূপে। বিশ্ব-মানবতাকে উপহার দিয়েছেন জাতী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আপন স্তরানুযায়ী অনুসরনীয় সার্বজনীন 'মাইজভান্ডারী ত্বরিকা'। মাইজভান্ডারী ত্বরিকার আদর্শালোকে মানবত্মার জাহের-বাতেন শোধন-পদ্ধতির দিক-নির্দেশ খুব সহজ আর সাবলিলভাবেই ফুটে উঠেছে মাইজভান্ডারী ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচক খাদেমুল ফোকারা হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (র:) এর পংক্তিমালায়। আধ্যাত্মিকতা আর মানবিকতার এমন তুঙ্গীয় মিলিত বহিঃপ্রকাশ সমসাময়ীক অন্যান্য সাধন পদ্ধতিতে বিরল।

প্রবৃত্তি,নিবৃত্তি ভবে জানো তিন ভাবে
বাক বিতন্ডা পরিহারে,
জানার আগ্রহে
পরদোষ পরিহারে, নিজ দোষ ধ্যানে
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষনে
না দেখাইবে 'পীর' যাকে
এই তিন ধারা

আসিবেনা সোজা পথে
সেই পথ হারা।।

সমাপ্ত

---

## গ্রন্থসূত্র

আলি বিন উসমান আল জুল্লাবী আল হুজবিরি, কাশফুল মাহজুব, অনু: ড: ইছআদ আবদুল হাদী ক্বিনদিল, মাজলিস আলা লিশ শুউণিল ইসলামিয়্যা, মিসর, ১৯৭৪।
আবদুল ওয়াহাব শারানি, আনওয়ারুল কুদসিয়্যাহ, মাকাতাবা মায়ারেফ, বৈরুত, ১৯৮৮
আবু নাঈম ইস্পাহানী, হুলিয়্যাতুল আওলিয়া, দারুল কুতুবুল আরাবী, বৈরূত, ২০০৬।
আবু বকর আহমদ বিন ওমর, মুসনাদ বাযযার, মাকাতাবুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদীনা মোনাওয়ারা, ১৯৮৮।
আবু হামেদ গাজ্জালী, ইহইয় উলুমিদ্দিন, দারুল মারিফা, বৈরূত, ১৯৯৮।
আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, মুআছছাতুর রিসালাহ, বৈরূত, ২০০১
ঈসা আবদুল কাদের, হাকায়েক আন তাসাউফ, দারুল ইরফান, হালব (সিরিয়া), ১৯৯৩।
মুছা শাহীন লাশিন,  ফাতহুল মুনয়িম, দার শুরুক, কায়রো, ২০০২।
মুহাম্মদ জাকি ইবরাহিম, উসুলুল বুসুল, দার নোবার, কায়রো, ২০০৫।
মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, সাহীহ মুসলিম, দার ইহইয়া তুরাছ আল আরবী, বৈরূত (লেবানন) ২০০১।
মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, সাহীহ বুখারী, দার তুকুন নাজাহ, কায়রো, ১৪২২ হিজরি।
মুহাম্মদ বিন ঈসা, সুনান তিরমীযি, মাকতাবাতু মুস্তাফা আল হালাবী, কায়রো, ১৯৯৮।
যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ আল আনসারি, নাতায়েজুল আফকার আল কুদছিয়্যা, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরূত ২০০০।
সায়ীদ হাওয়া, তারবিয়াতুনার রুহিয়্যাহ, দারুস সালাম, কায়রো, ২০০৪।
সায়ীদ হাওয়া, মুজাককিরাত ফি মানাজিলিস ছিদ্দিকিন ওয়া রাববানিয়্যিন, দারুস সালাম, কায়রো, ২০০৪।
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহঃ), গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কারামত, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম ১৯৬৭।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহঃ), বেলায়তে মোতলাকা, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, তৃতীয় সংস্করণ, চট্টগ্রাম ১৯৭৪।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভা-ারী (রহঃ), মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, পঞ্চম সংস্করণ, চট্টগ্রাম ২০১১।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহঃ), মানব সভ্যতা, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮।